ইসলাম ও সার্বজনীন মানবাধিকার

﴿ الإسلام وحقوق الإنسان العامة ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

শায়খ লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ الإسلام وحقوق الإنسان العامة ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

সার্বজনীন মানবাধিকার ও ইসলাম

মানবাধিকার বলতে বুঝায় মানুষের সহজাত অধিকার। মানুষ তার এ সহজাত অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে সে কখনই তার অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ পায়নি। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। শক্তিধর লোকেরা দুর্বলের দাবীকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে। রাজ্যে মারামারি, খুনাখুনির বন্যা বয়ে গেছে। দুর্বলের উপর সবলের এ জুলুম কখনও সমাজের নামে, কখনও দেশের নামে, কখনও বা ধর্মের আবরণে চালানো হয়েছে। মানবতার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননা যুগে যুগে মানুষের মৌলিক অধিকারকে করেছে পর্যুদস্ত। সেজন্য মানুষকে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

মানব ইতিহাসের শুরু থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়ে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামের কোন ইতিহাস আমরা জানি না। সে সময়ে বিশ্বের সরকার পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিগত কেন্দ্রীভূত শাসন। বিধিবদ্ধ শাসনতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন শাসকদের খেয়াল-খুশিজনিত মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল রাষ্ট্রের আইন। কাজেই, সেখানে শাসকের পক্ষে জনস্বার্থের পরিপন্থী যে কোন আচরণ করার অবকাশ ছিল।

কিন্তু সপ্তম শতকে মানবতার মুক্তিদূত মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে নতুন কথা শুনিয়ে বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করেন। ওহী লাভ করে তিনি প্রচার করেন যে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা এবং মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত–সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের এ ঘোষণা এক ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোন জীবনব্যবস্থায়ই করা হয়নি। ইসলাম বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। ইসলাম বলে, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সব মানুষই সমান এবং একে অন্যের ভাই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য না থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না। তাঁর মতে, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দেশে পরতমসহিষ্ণুতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। হিজরতের পর তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে এক বৈঠকে বসেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে ৬২৪ সালে এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন। এ সন্ধিপত্র ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে আখ্যায়িত। 'মদীনার সনদ' পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান এবং একে মহাসনদ বলা যেতে পারে। আরবী ভাষায় লিখিত মদীনার সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। কয়েকটি প্রধান ধারা নিচে উল্লেখ করা হল– :

- মদীনার সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা একটি জাতি (কমনওয়েলথ) গঠন করবে।
- পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হল।
- দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।
- ইহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

এসব ধারায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই পৃথিবীতে প্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়েও আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানরা নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করে তাদের খলীফা নির্বাচন করেন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে আবু বকর রা. তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন, 'আমি সৎপথে থাকলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং সমর্থন যুগাবেন, আর বিপথগামী হলে উপদেশ দিয়ে পথে

আনবেন।' ওমর রা.–এর খেলাফতকালেও প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ছিল। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজস্ব অভিমত, অভিযোগ, বিকল্প প্রস্তাব ইত্যাদি পেশ করতে পারতেন। এর প্রমাণ আমরা পাই যখন আমরা দেখি যে, একদা একজন সাধারণ ব্যক্তি মসজিদে খুতবা পাঠের প্রাক্কালে কাপড় বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে খলীফার নিকট কৈফিয়ত চেয়ে তাকে খুতবা পাঠ থেকে বিরত রেখেছিলেন। জনগণের নাগরিক অধিকার ভোগ করার এ ধারা আলী রা.–এর শাসনামল পর্যন্ত (৬৬১ সাল) অব্যাহত ছিল।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে ইসলামের স্বীকৃত মানবাধিকার কাগজে-কলমে ঠিক থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ ক্ষমতা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। কারণ, গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার কারণে শাসক ও তার সহযোগীরা রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। মুসলমানদের সোনালী যুগের পরে অর্থাৎ দশম শতকের পর থেকে আমাদের দৃষ্টি ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডের উপর নিবদ্ধ হতে থাকে। এ সময়ে সারা ইউরোপে জনগণের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নানাভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মানবাধিকার তখন ছিল ভূলুণ্ঠিত। এ অবস্থার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজা জনের নানাবিধ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য স্টিফেন ল্যাংটনের নেতৃত্বে তার সহযোগীরা তাদের অধিকারসমূহ একটি দলীলে লিপিবদ্ধ করেন এবং ১২১৫ সালে রাজাকে এ দলীলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এ দলীলই ইতিহাসে ম্যাগনা কার্টা বা মুক্তির মহাসনদ নামে বিখ্যাত। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ম্যাগনা কার্টায় ৬৩টি ধারা আছে। এ ধারাসমূহে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সীমিত করা হয় এবং কতিপয় অধিকারের স্বীকৃতিদান করা হয়। নিম্নে এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হল–

- রাষ্ট্রের সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজা কোন কর নির্ধারণ করতে পারবেন না।
- রাজা চার্চের স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।
- বিনা বিচারে রাজা কোন স্বাধীন প্রজাকে বন্দী, নির্বাসিত বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি দিতে পারেন না।
- রাজা যদি মহাসনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন তাহলে ২৫জন নিয়ে গঠিত সমিতি তাকে বাধা দিতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করতে পারবে।

ম্যাগনা কার্টায় কতিপয় মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হলেও তাতে সব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি। কেননা, যারা রাজা জনকে এ দলীলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের অধিকার রক্ষা করা এবং আরো সুবিধা লাভ করা। এছাড়া এ সনদে ব্যারনদের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং রাজা সেগুলো উপেক্ষা করে চলেছিলেন। তাই ম্যাগনা কার্টায় যে অধিকার খর্ব করা হয়েছিল তা আদায়ের জন্য রাজা ও ব্যারনদের মধ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটের জন্ম হয়। এতে রাজার স্বৈরাচারী কাজ যেমন পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া করারোপ, বেসরকারী বাড়িতে সৈন্যদের ভাড়ায় রাখা, সামরিক আইন প্রবর্তন এবং অন্যায়ভাবে জনগণকে বন্দী করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। প্রথম চার্লস অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিটিশন অব রাইট বা প্রজার অধিকারের আবেদনপত্র মেনে নেন। এ আবেদনপত্র ইতিহাসে দ্বিতীয় ম্যাগনা কার্টা বা মুক্তির দ্বিতীয় মহাসনদ নামে পরিচিত।

প্রথম চার্লস পিটিশন অব রাইট মেনে নিলেও তিনি সে মোতাবেক কাজ করেননি। তিনি পূর্বের মতই তার স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলস্বরূপ ১৬৪৯ সালে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তাই দেখা যায় যে, পিটিশন অব রাইটের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যায়নি। এ কারণে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলতেই থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৬৭৯ সালে হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এ আইনটিও মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সাফল্যের স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত। এ আইনে স্থির হয় যে, কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অনিশ্চিতকালের জন্য বন্দী করে রাখা যাবে না। কাউকে বন্দী করা হলে তাকে অনতিবিলম্বে বিচারাধীন করতে হবে এবং সন্তোষজনক কারণ না পেলে বিচারকগণ ঐ ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে পারবেন। 'হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট' প্রণীত হলেও তার বাস্তবায়ন পুরোপুরিভাবে না

হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ফলে, ১৬৮৯ সালে বিল অব রাইট বা অধিকার আইন নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় রাজশক্তির সাথে জনশক্তির শতাব্দীকালের বিরোধের অবসান হয় এবং এরপর রাজশক্তি জনশক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিল অব রাইটসও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর একটি স্তম্ভ। কিন্তু এ অধিকার আইনও সকলের জন্য মৌল মানবাধিকরের দাবীর প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। যা হোক, 'বিল অব রাইটস' গৃহীত হওয়ার অল্পকাল পরেই 'টলারেসন অ্যাকট' বা ধর্ম সহিষ্ণুতা আইন নামে আর একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইনে রোমান ক্যাথলিক ব্যতীত প্রোটেস্ট্যান্টদের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে ইংল্যান্ড অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের পরে আমেরিকায় অবস্থিত বৃটিশদের উপনিবেশগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশ পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি না থাকার কারণে এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে উপনিবেশগুলোর উপর কর আরোপ করায় আমেরিকার বৃটিশ ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ স্বাধীনতার যুদ্ধ মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিকগণ জয়লাভ করেন এবং ১৭৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার সম্মেলনে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা পত্রে মানবাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়–

"ডব যড়ষফ ঃযবংব ঃৎঁঃযং ঃড় নব ংবষভ-বারফবহঃ, ঃযধঃ ধষষ সবহ ধৎব পৎবধঃবফ বয়ঁধষ, ঃযধঃ ঃযবু ধৎব বহফড়বিফ নু ঃযবরৎ পৎবধঃড়ৎ রিঃয পবৎঃধরহ রহধষরবহধনষব ৎরমযঃং, ঃযধঃ ধসড়হম ঃযবংব ৎরমযঃং ধৎব ষরভব, ষরনবৎঃু ধহফ ঢ়ঁৎংঁরঃ ড়ভ যধঢ়ঢ়রহবংং"

এসব সত্যকে স্বপ্রমাণিত মনে করি যে, সব মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের স্রষ্টা তাদেরকে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ।

ফিলাডেলফিয়ার ঘোষণার সাথে আরো কতিপয় মৌলিক অধিকার যোগ করে আমেরিকার সংবিধানে উন্নতি করা হয়। এগুলো হচ্ছে– কথা বলার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সরকারের কাছে আবেদনের স্বাধীনতা ইত্যাদি। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঘোষণায় মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করা হয়েছে এবং তা হল 'অবিচ্ছেদ্য মানব অধিকার।'

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের পর মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে ফ্রান্স। ফ্রান্সের জনগণ যখন নানাভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও যথেচ্ছা করারোপের ভারে জর্জরিত হয়ে দারুণ অসহায়ের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিল, তখন ভলটেয়ার, রুশ্যে প্রমুখ ফরাসী পণ্ডিত 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র বাণী প্রচার করলে তারা আশান্বিত হয় এবং বিপ্লবী ভাবাপন্ন হয়ে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে। এ অবস্থায় আমেরিকা স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা দেশে ফিরে স্বাধীনতার কথা শুনালে বিপ্লবীরা ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে, ১৭৮৯ সালে রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু হয়। এ বিপ্লবে ফরাসী রাজারা পরাজিত হন এবং তিনি নতুন শাসনতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য হন। এ শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা ষোড়শ লুই ও রানী মেরী এনটয়নেটকে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয় (১৭৯৩ সালে)। এরপর ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব। যারা ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তারাই তাদের আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হন। তারা বিপ্লব বিরোধী বলে হাজার হাজার লোককে গলাটিপে হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন রোনাপার্ট কর্তৃক সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয় এবং তিনি নিজেই ফ্রান্সের সম্রাট হন। এভাবে ফরাসী বিপ্লবে অর্জিত ফল

আবার বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে আদর্শ বিপ্লবীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা একেবারে মুছে যায়নি, বরং তা অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসী দেশে জনগণের অধিকার বিস্তৃত হওয়ার ফলে ইংল্যান্ডের জনগণ আবার পার্লামেন্টের সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৩২ সালে প্রথম সংস্কার আইন পাস হয়। এ আইনের বলে সীমিত সংখ্যক লোক ভোটাধিকার পায়। পার্লামেন্টে অভিজাতগণের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দরিদ্র নগরবাসী কৃষক ও সাধারণ শ্রমিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সংস্কার আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৮৬৭ সালে দ্বিতীয় সংস্কার আইন গৃহীত হয়। এ আইনে শহরে প্রায় সব গৃহস্থই ভোটদানের অধিকার পায়। উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিকরাও ভোটাধিকার লাভ করে। কিন্তু এবারেও ছোট ছোট অনেক শহর প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং আসনগুলো বড় শহরগুলোর মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। ফলে, সংস্কার আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৮৪ সালে তৃতীয় সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এবারে এ আইনের বলে গ্রামবাসী শ্রমিকগণও ভোটদানের অধিকার পায় এবং 'বরো' ও 'কাউন্টির' ভোটাধিকার মান সমপর্যায়ভুক্ত হয়। তৃতীয় সংস্কার আইন পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। এভাবে মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্যের জয়যাত্রা এগিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই বিশ্ব রাজনীতি দিগন্তে কালো মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে এবং তারই ফলস্বরূপ মানব সভ্যতা অসহায়ভাবে দু'টো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করল। জনগণ বিভিন্ন ঘোষণা ও দলীলের তথাকথিত মানবাধিকার পদদলিত করে লাখ লাখ নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশু বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখল। এরপর প্রথম ভার্সাই চুক্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের উপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি মানব সনদ কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তার নাম দেয় মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক এ মানবাধিকার সনদ ঘোষিত হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক এ মানবাধিকারের ঘোষণায় যেসব মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হল−

সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের পরস্পরের প্রতি আচরণ ভাইয়ের মত হওয়া উচিত।

- আইনের চোখে সকল মানুষ সমান এবং সমানভাবে আইনের রক্ষাকবচ পাওয়ার অধিকারী।
- নারী, পুরুষ, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, সামাজিক মর্যাদা, জন্ম ও অন্যান্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষ জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকার ভোগ করার অধিকারী।
- প্রত্যেক ব্যক্তির (ক) জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, (খ) প্রতিটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা, (গ) নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য রাষ্ট্রের আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভ, (ঘ) জাতীয়তা, (ঙ) বিয়ের সময় ও বিচ্ছেদের সময় সমান অধিকার, (চ) এককভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন, (ছ) চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, (জ) যে কোন মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার, (ঝ) শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতি করার, (ঞ) দেশের সরকারে অংশগ্রহণ, (ট) মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন, (ঠ) নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা, বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসময়ের সীমা এবং ন্যায় পারিশ্রমিক লাভ, (ড) স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপযোগী জীবনযাত্রা এবং (ঢ) সকলের সাথে সমানভাবে সব ধরনের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- কাউকে দাস করা যাবে না এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে। নির্যাতন বা নিষ্ঠুর অমানবিক শাস্তি দেয়া যাবে না। স্বেচ্ছাচারভাবে গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দেয়া যাবে না এবং স্বেচ্ছাচারভাবে কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো যাবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, ৬২৪ সালে রাষ্ট্রনায়ক মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত 'মদীনা সনদে'র 'কনসেপ্ট' বা ধারণাই পুনরায় নতুন করে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা সকল অধিকার ভোগ করে থাকে। সামাজিক অধিকার বলতে বুঝায় বাঁচার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মালিকানার অধিকার, সাম্যের অধিকার, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার, লেখা, বলা ও প্রচার কার্যের অধিকার। বিবাহের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার ইত্যাদি। প্রত্যেক নাগরিকের খাওয়া, পরা, থাকা, চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের অর্থনৈতিক অধিকার রয়েছে। মুসলমান নাগরিকরা শাসককে সমালোচনারও অধিকার রাখে।

ইসলাম সবচেয়ে বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা। মানবতার মর্যাদা ইসলামেই সর্বাধিক স্বীকৃত। অতএব, জাতিসংঘ সনদ নয়, ইসলাম মানবাধিকারের একমাত্র গ্যারান্টি।

সমাপ্ত